KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

ব্রিটিশ সরকারের অরণ্য নীতি ও বন্য প্রানী নিধন : অধিকার ও অস্তিত্বের সংগ্রাম নিয়ে একটি পর্যালোচনা

সুজিত পোড়্যা
পি এইচ ডি গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকে শাসক ও উচ্চবৃত্তদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ এবং বীরত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শন করার মাধ্যম ছিল শিকার করা। ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে সাধারণ ভাবে দুই রকমের কারনে শিকার করার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম হল জীবিকার জন্য শিকার করা। অরণ্যের অধিবাসীরা এই শিকার করতেন তাদের খাদ্যের জোগানের জন্য। অন্যটি হল বিনোদন বা সামাজিক মর্যাদার জন্য শিকার। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বন উচ্ছেদ করে নতুন করে কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা এবং সেখান থেকে রাজস্ব আদায় করা। ভারতে উপনিবেশিক শাসনের মূল লক্ষ্যই ছিল সাম্রাজ্যের স্বার্থে উপনিবেশিক অর্থনীতির উৎস গুলিকে সুস্থিতি প্রদান করা। এই সুস্থিতি প্রদান করার জন্য বনের হিংস্র প্রানীদের নিয়ন্ত্রন করে বা হত্যা করে কমিয়ে আনার প্রয়োজন হয়ে পরে। এই কাজটি সম্পাদন করার জন্য পেশাদার ব্যক্তিদের বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে আমার গবেষণা পত্রে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত অরণ্য নীতি নেওয়ার সাথে সাথে কিভাবে বন্য পশু হত্যায় মেতে উঠেছিল তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: বন উচ্ছেদ, সাম্রাজ্যের স্বার্থে উপনিবেশিক অর্থনীতি, বিশেষ পুরস্কার, শিকার, বন্য পশু হত্যা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের ইতিহাসে শিকার করার মধ্যে দিয়ে রাজরাজাদের আমোদ-প্রমোদের প্রথা চলে আসলেও প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষার সাথে সাথে বন্যপ্রানী হত্যা না করারও বিধান দিয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, ভারতে ব্যাপক ভাবে পশু হত্যা বা শিকার কখনই হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনের পর এই চিত্রের আমূল পটপরিবর্তন ঘটে। বানিজ্যের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদের সাথে উপমহাদেশের যোগাযোগ গড়ে উঠলেও কিছু দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের সম্পদ দেখে তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এই দেশে সমস্ত ক্ষমতা দখল করার একমাত্র রাস্তা হল ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করা। যাইহোক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করে। রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেই কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা থেমে থাকেনি, তারা তাদের অধিকারকে বৈধতা প্রদানের জন্য বেশ কিছু নীতি গ্রহন করে। ব্রিটেনের রাজার মত জমকালো পোশাক পরতে শুরু করে। ব্রিটেনের উচ্চশ্রেনির মানুষদের কাছে শিকার করা ছিল একটি বিনোদন মাত্র, এটিকে তারা একটি অবসর সময় কাটানো বা খেলা হিসেবেই দেখত, অষ্টাদশ শতকে

ভারতেও এই রীতিটি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল একটি খেলা হিসেবেই।[1] মুঘল শাসকরাও শিকার করতেন, নিজেদের বীরত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন। মুঘলদের এই রীতিটি ব্রিটিশরা গ্রহন করে সাধারণ মানুষদের থেকে রাজকীয় বৈধতা পেতে চেয়েছিল।

মুঘল শাসকরা একজন ভালো যোদ্ধার সাথে সাথে একজন ভালো শিকারিও ছিলেন। প্রায় সব মুঘল শাসকরা শিকার করলেও শিকারে যে মুঘল সম্রাটরা প্রসিদ্ধ লাভ করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। তিনি দলগত ভাবে ২৮৫৩২ টি বন্যপ্রানী শিকারের সাক্ষী থাকলেও, নিজে মোট ১৭১৬৭ টি বন্যপ্রানী শিকার করেন। যাদের মধ্যে ছিল ১৬৭২ টি কৃষ্ণসার হরিণ, হরিণ, পাহাড়ি ছাগল, ৮৮৯ টি নীলগাই, ৮৬ টি সিংহ, ৬৪ টি গন্ডার, ১০১৬৭ টি পায়রা, ৩৪৭৩ টি কাক, ১০ টি কুমির। নূরজাহান তাঁর স্বামী অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সাথে একটি বাঘ শিকার করেন।[2] এক সময় কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদের নিকটে অবস্থিত) "Tiger Shooting Party" র জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় এখানে বাঘের দেখা পাওয়া যেত না।[3] সুতরাং এখানে বলা যায়, মুঘলযুগেও বাংলায় প্রায় সর্বত্র বাঘের দেখা পাওয়া যেত। কেননা, কাশিমবাজারের অবস্থান উর্বর গাঙ্গেয় সমভূমিতে হওয়া শর্তেও এখানে গভীর বন ছিল, এই তথ্য অনুযায়ী অনুমান করা খুব একটা কঠিন বিষয় নয়। যাইহোক, পরে এখানে চাষাবাদ ও শহরের উত্থানের কারনে সেই খ্যাতি ম্লান হয়েছে।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশরা ভারতে রাজনৈতিক অধিকার দখল করে ঠিকই, কিন্তু তখনও অবধি শুধুমাত্র কর আদায় করা ছাড়া অন্য কোন কাজ তাদের ছিল না। কেননা তখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক বিষয়টি মুঘল শাসকের হাতেই ছিল। যাইহোক, পরবর্তী সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটলে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী আমলা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পরে। শাসন ব্যবস্থার পরিচালনা এবং সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর সংখ্যক যুবকদের নিয়ে আসা হয় মূলত সেনাবাহিনীতে সৈন্য হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য। সঙ্গে তারা নিয়ে আসলো ইংল্যান্ডের আভিজাত্যের কিছু চালচলন। তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিল নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য বন্যপ্রানী হত্যা করা বা শিকার করা। বন্যপ্রানী শিকার করা কে sports বলে গন্য করা হত। বলা হয়, পৃথিবীতে যত রকম sports আছে তার মধ্যে কঠিন হল বন্য প্রানী শিকার করা। কঠিন, কষ্ঠসহিষ্ণু শরীর, লোহার মত স্নায়ু, সাহস, সজাগ চোখ আর কান, বুদ্ধি আর আসীম ধৈর্য, এই সব কিছুই প্রয়োজন হয় শিকারে।[4] শুধুমাত্র আমোদের জন্যই নয়, ব্রিটিশ শাসনের একটি বৈধতা প্রদানও ছিল শিকার করার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্রিটিশরা ছিল বুদ্ধিমান, উন্নত, দৈহিক দিক থেকে সুঠাম ও শক্তিশালী জাতি, তারা তা শিকার করার মধ্য দিয়েই প্রমান করার চেষ্টা করেছিল এবং উন্নত জাতিগত সত্ত্বার বৈধতা পেতে চেয়েছিল। ইংরেজ বাচ্চার মধ্যে এই খেলার উৎসাহ ও আগ্রহ আর একাগ্রহতা ছিল, এই অভ্যাস গুলিই পরে তাকে জীবনের ঝড়ঝাপটা তাড়িয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙ্গীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছিল।[5] এই জন্যই হয়ত বেঙ্গল আর্মির ক্যাপ্টেন হেনরি শেক্সপিয়র তাঁর গ্রন্থ "The Wild Sports of India" তে সুপারিশ করেছিলেন শিকার করতে, শিকারে মধ্যে দিয়ে তাঁদের পেশীশক্তি প্রদর্শন করা এবং এই অভ্যাস তাঁদের নারী ও মাদক থেকে দূরেও রাখতে পারবে।[6] এছাড়াও যুদ্ধের ময়দানে নানান অভিজ্ঞতা একজন যোদ্ধার প্রয়োজন হয়, এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে মৃগয়াতে বা শিকারক্ষেত্র থেকে। নানান যুদ্ধের ময়দানে দেখা গেছে এক ভালো শিকারি বা sports-man রাই ভালো যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। তার বেশির ভাগটাই তারা অর্জন করেছিল শিকারক্ষেত্রতে বা Hunting ground এ।[7] সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই শিকারিরা বড় ও ভয়ংকর বন্য জীবজন্তুদের হত্যা করা শুরু করেছিল। এই শিকারগুলি হল বাঘ, হাতি, চিতা, বিভিন্ন ধরনের হরিণ, ভাল্লুক, গন্ডার, কুমির ইত্যাদি।

এই ভাবে শিকার করা হয়ে উঠল আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা, বিনোদন, খেলা, ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই মূলত এক সময় বাংলা প্রদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের থেকে শিকারের

ব্যাপারে অনেক বেশি উন্নতি করেছিল। বাংলায় জমিদারদের মধ্যে শিকার নিয়ে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শিকার করা তাঁরা গৌরবের কথা বলে মনে করতেন। আর এই সূত্রে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।[8] বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার কারনে এক শক্তিশালী জমিদার শ্রেনীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা সবসময়ই সমাজে মর্যাদা পেতে চেয়েছিল। এছাড়াও নতুন এক বনিকশ্রেনি যারা নতুন করে জমিদারী ক্রয় করে আভিজাত্যর প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিল। এই সমস্ত জমিদাররা মাঝে মধ্যেই একত্রিত হয়ে রাজকীয় শিকারে যেত। এই সমস্ত শিকারিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। হেনরির ভাষায়, "There are many sportsmen in India who have had more experience in shikar, that is, in hunting and killing the large game with which its forest about."[9]

তবে এই সব বন্য প্রানীদের মধ্যে বাঘ শিকার ছিল খুবই জনপ্রিয়, কেননা এই প্রানীটি বাংলার সর্বত্রই দেখা মিলত। এছাড়া বাঘ মারলে তা সামাজিক দিক থেকেও খুব সম্মানের ছিল। বাঘ প্রজাতিদের খাদ্যের অভ্যাসের দিক থেকে বিচার করে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, cattle lifter, এ শ্রেনীর বাঘরা সাধারণত গোবাদী পশু শিকার করে খায়। দ্বিতীয়ত, Game killer, এর শ্রেনীর বাঘরা বন্য জন্তুর উপর নির্ভর করে জীবন ধারন করে। তৃতীয়ত, Man-eater, নরভুক বাঘ বা মানুষ খেকো বাঘ। এই তিন শ্রেনীর মধ্যে cattle lifter সচরাচরই দেখা যেত।[10] এরা বাংলার গ্রামীন মানুষদের গৃহপালিত প্রানী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি প্রানীদের শিকার করত। গ্রামীন লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট ঝোপঝাড় বা জঙ্গলেই থাকতে পছন্দ করত, কেননা অল্পায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত। এছাড়াও মাঝে মাঝে বাঘ নানা কারনে মানুষদের আক্রমণ করত এবং অনেক সময়ই হত্যাও করত। এই ভাবেই কিছু শ্রেনীর বাঘ হয়ে উঠত "মানুষ খেকো বাঘ" বা "Man-eater"। সুতরাং বাঘ শিকার ছিল প্রান্তিক এলাকা গুলিতে অর্থনৈতিক জীবন সচল রাখার একটি উপায়ও।

বাঘ থেকে মানুষ খেকো বাঘ হয়ে ওঠার অনেক কারন আছে। এই সমস্ত কারনের জন্য একপ্রকার মানুষই দায়ী। বাঘদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাঁরা মানুষের থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে। মানুষ খেকো বাঘ বলে কোন বিশেষ শ্রেনীর বাঘ হয় না। বাঘের বার্দ্ধক্যে কষ্ট সাধ্য শিকার করার শক্তি কমে গেলে কোন কোন সময় এরা সহজলভ্য মানুষকে আক্রমণ করে খাদ্যের আশায়। এই ভাবেই কোন বাঘ দুই-এক জন মানুষকে হত্যা করলে সাধারণ বাঘই হয়ে ওঠে 'মানুষ খেকো বাঘ'। এই ভাবেই কোন বাঘিনী মানুষ খেকো হলে তার সন্তানগনও ক্রমে মায়ের থেকে শিক্ষালাভ করে মানুষ খেকো হয়ে পরে। একবার মানুষ খেকো হয়ে পরলে আর এমন শ্রেষ্ঠ, সুখাদ্য নরম মাংস ত্যাগ করে সহজে আর অন্য মাংস খেতে চায় না। দৈবাৎ কোন কারনে মানুষ জখম করলেই কোন বাঘ মানুষ খেকো হয়ে পরে না।[11] মানুষের কার্যকলাপের কারনে বনের মধ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে "Ecological Imbalance" টি বাঘের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। খাদ্যের অভাবেই সাধারণ বাঘ মানুষ খেকো হয়ে ওঠে।[12] যদিও সুন্দরবনের বাঘ প্রকৃতিগত ভাবেই 'মানুষ খেকো' বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশদের আসার অনেক আগেই একজন পোর্তুগিজ ব্যবসায়ী, যিনি ১৫৯৮-৯৯ তে বাংলাতে আসেন, তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার বাঘকে মানুষের মাংস খাওয়ার কথা বলেছে।[13] প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে তার সমস্ত জীব-জগতকেই সংরক্ষণ করে চলে। এই ভাবেই প্রতিটি এলাকাতেই একটি নিজস্ব খাদ্য শৃঙ্খল গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা কোন ভাবে প্রাকৃতিক ভারসম্য নষ্ট হলে পুরো খাদ্য শৃঙ্খলটি ভেঙে পরে। তখনই খাদ্যের অভাবে ঐ এলাকাতে বসবাসরত প্রানীদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে পরে, ফলে তারা খাদ্যের অভাবে অতিষ্ঠ হয়ে বিকল্প খাদ্যের সন্ধান করে। এই ভাবেই সাধারণ বাঘ খাদ্যের জন্যই মানুষ খেকো বাঘ হয়ে ওঠে। সাধারণত ১০/১৫ জন লোক হত্যা করার পরই মানুষ খেকো বাঘরা শিকারীর দ্বারা নিহত হয়। তবে ছোট নাগপুর অঞ্চলে একবার এক মানুষ খেকো বাঘ প্রায় ৭০০ লোক হত্যা করে ঐ

অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে।[14] এই সমস্ত বাঘকে মারার জন্য সরকারের তরফ থেকে এক বিশেষ ধরণের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হত। এই ধরণের শিকারকে বলা হত 'Reward Hunting'।

ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে সাধারণ ভাবে দুই রকমের কারনে শিকার করার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম হল জীবিকার জন্য শিকার করা। অরণ্যের অধিবাসীরা এই শিকার করতেন তাদের খাদ্যের জোগানের জন্য। অন্যটি হল বিনোদন বা সামাজিক মর্যাদার জন্য শিকার। এই শিকারে অংশগ্রহন করতেন রাজ-রাজারা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রঞ্জন চক্রবর্তী শিকারির উদ্দেশ্য অনুসারে শিকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। জীবন-ধারনের জন্য শিকার, আমোদ-প্রমোদের জন্য শিকার এবং আত্মরক্ষার জন্য শিকার।[15] প্রথমটি সাধারণত জীবন ধারনের জন্য ছোটো ছোটো বন্য প্রানীদের উপজাতীয় মানুষরা শিকার করে থাকে। আমোদ প্রমোদের জন্য রাজা-মহারাজা, জমিদার, বড় প্রশাসনিক অফিসাররা করত। সব থেকে বেশি বন্য প্রানী মূলত বড় মাপের প্রানীদের শিকার করা হত। আত্মরক্ষার জন্যও শিকার করা হত সেই সময়, তবে যতখন না পর্যন্ত বন্য প্রানী কৃষিজ ফসল বা সাধারণ মানুষের কাছে বিপদ জনক না হয়ে উঠত। এই গুলির মধ্য প্রথমটি খুব বেশি হানিকারক ছিল না। বন্য প্রানীদের জন্য সব থেকে ক্ষতিকারক ছিল আমোদ-প্রমোদের জন্য শিকার। যেমন কোচবিহারের রাজা কোচবিহার, ডুয়ার্স এবং আসামে শিকার করেন। তাঁর ১৮৭১ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাঁইত্রিশ বছর শিকারের সময় পর্বে তিনি ৩৭০ টির বেশি বাঘ, ২৮০ গন্ডার, ৪৩০ বন্য মহিষ, ৩২৪ টি বড়সিমহ জাতের হরিণ এবং অসংখ্য ছোটো বন্য প্রানীদের শিকার করেছেন।[16] নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রাজা-মহারাজারা বা কোন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সরকারি অফিসাররা যে রাজকীয় শিকারের আয়োজন করতেন তাতে অনেক বন্যপ্রানীর হত্যা করা হত। একসাথে অনেক বেশি শিকার করার ফলে বনের মধ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পরত।

ব্রিটিশ সরকার নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য অরণ্য অঞ্চলগুলিতে পুরানো প্রথা ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থাপনা শুরু করে মূলত রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য।[17] রাজস্ব বৃদ্ধি করার সব থেকে সহজ উপায় ছিল বন উচ্ছেদ করে নতুন করে কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা এবং সেখান থেকে রাজস্ব আদায় করা। ভারতে উপনিবেশিক শাসনের মূল লক্ষ্যই ছিল সাম্রাজ্যের স্বার্থে উপনিবেশিক অর্থনীতির উৎস গুলিকে সুস্থিতি প্রদান করা।[18] এই কারনে ১৮৭০ এর দশকে কৃষি জমিগুলিকে দুই রকম ভাবে শ্রেনী বিভক্ত করা হয়, প্রথমটি হল সাধারণ কৃষিজমি এবং অন্যটি হল বিশেষ কৃষিজমি।[19] বিশেষ কৃষি জমিতে মূলত অর্থকারী ফসল গুলি লাগানো হত। অর্থকারী এবং উপকারী গাছগুলির জন্য নানা ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল।[20] যেমন, দার্জিলিং চা, সিঙ্কোনা ইত্যাদি।

রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য অরণ্যের প্রান্তভাগের জমিগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করার কারনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সাথে সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়েছিল।[21] জলপাইগুড়ি জেলাতে ১৮৭৪-৭৫ সালে চা চাষ শুরু হলেও ১৮৭৭ সাল থেকে চা চাষের জন্য জমি লীজ দেওয়া শুরু হয়। ১৮৯৪ সালে ১৮২ টি চা বাগান ছিল, যাদের আয়তন ছিল ১৩৯৭৫১ একর।[22] ১৮৭৫-৭৬ সালে প্রচুর পরিমাণে বাংলা থেকে চা ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হয়েছি। ঐ বছর ভারত থেকে যে পরিমাণ চা রপ্তানি করা হয় তা ছিল চিনা চায়ের ছয় ভাগের এক ভাগ, বিগত কয়েক বছর আগেই যা ছিল এগারো ভাগের এক ভাগ।[23] অরণ্যের প্রান্তভাগের জমিগুলিকে "wasteland" হিসেবে ঘোষণা করে চা চাষের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই লীজ ইউরোপীয় আবাদকারীদের দেওয়া হয়েছিল নামমাত্র রাজস্বের বিনিময়ে।[24] ১৯০১ সালে ৫ একর জমি Mahaldaram Tea Estate কে দেওয়া হয়।[25] ১৯০১-০২ সালে সুন্দরবনের ৫০৩৬৬ একর জমি অর্থাৎ ৭৯ স্কয়ার মাইল জমি কৃষিজমিতে পরিণত করার জন্য পরিষ্কার করা হয়।[26] ১৯০২-০৩ সালের ফরেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী, বক্সা ডিভিশনের ৮৮৬ একর জমি চা বাগানের জন্য দেওয়া হয় এবং ঐ বছরই সুন্দরবনের ৫৪ হাজার ৯৫৩ একর জমি অরণ্য পরিষ্কার করে কৃষিজমিতে পরিণত করা হয়।[27] সিঙ্কোনা গাছ থেকে প্রাপ্ত কুইনাইন ম্যালেরিয়ার

প্রতিষেধক। দার্জিলিং এর মাংপোতে ১৮৬২ সালে প্রথম সিঙ্কোনা চাষ শুরু হয়। এর পর থেকে নানা সময়ে সিঙ্কোনা চাষের জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সিঙ্কোনা ডিপার্টমেন্টকে জমি লীজ দেওয়া হত। ১৯০৩ সালে তিস্তা ফরেস্ট ডিভিশনের ৭১০ একর জমি সিঙ্কোনা ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয় এবং ১৯১০ সালে সরকারের আদেশ অনুযায়ী এই ডিভিশনে সিঙ্কোনা চাষের বিস্তারের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।[28] ব্রিটিশরা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়কে এমন ভাবে বদলে দিলেন যা বোঝাতে Waddell সাহেব লিখলেন, "গোটা অরণ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এখানে ওখানে খাদের ধারে একটা দুটো নির্জন গাছ সেই রাজকীয় অরণ্যের চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে।[29] আগ্রাসী কৃষির জন্যই জঙ্গলের ধ্বংস ঘটেছে। এই ভাবে ব্রিটিশ সরকারে অর্থনৈতিক স্বার্থে ভারতের অরণ্য সম্পদ নিঃশেষিত হয়ে পরে এবং স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তুতন্ত্রের উপর খুব খারাপ প্রভাব পরে। মানুষ ও প্রানীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বনের মধ্যে ইংরেজদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পুরস্কার প্রদান করার মধ্যে দিয়ে বন্য পশু নিধন শুরু করে। বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রে হিংস্র পশু বাঘের নিধনই হয়ে ছিল বেশি। কেননা মানুষ খেকো বাঘ হত্যা করলে পুরস্কারের পরিমাণ ছিল অন্যান্য প্রানীদের থেকে বেশি। তাই বাঘ শিকার করতে শিকারীরা বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল।

সুন্দরবনে বাঘ হত্যার জন্য পুরস্কার

সাল	প্রাপ্ত বয়স্ক বাঘ	শিশু বাঘ
১৮৮৩	৫০ টাকা	১০ টাকা
১৯০৬	১০০টাকা	২০ টাকা
১৯০৯	২০০ টাকা	তথ্য পাওয়া যায় নি

Source: PRAF 1883-84, 1906-07, 1909-10

বিজ্ঞানের বিস্তারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। রেলইঞ্জিনের আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব নিয়ে আসে। ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলগাড়ি চললেও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ পর থেকে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। ভারতে রেল পথের বিস্তারের ছিল ভারতের অরণ্য ধ্বংসের এক প্রধান কারন। রেল পথের জন্য শাল গাছ সহ অন্যান্য শক্ত কাঠের শ্লিপার ব্যবহার করা হত। একটি ১০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গাছ থেকে ১টি, ১৪ ইঞ্চি থেকে দুটি, ১৭ ইঞ্চি থকে ৩ টি এবং ১৯ ইঞ্চি থেকে চারটি শ্লিপার পাওয়া যেত।[30] শিলিগুড়ির Eastern Bengal State Railway র জন্য তিস্তা ডিভিশন থেকে শাল কাঠের শ্লিপার আনা হত। রাজাভাতখাওয়া ডিপোর্ট-এর জন্য শ্লিপার আনা হয়েছিল বক্সা ডিভিশন থেকে। অন্যদিকে Bengal-Duars Railway র জন্য জলপাইগুড়ি ফরেস্ট ডিভিশন থকে শাল কাঠ নেওয়া হয়েছিল।[31] Cooch behar State Railway র জন্যও বক্সা ও জলপাইগুড়ি ডিভিশন থেকে শ্লিপার আনার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও অপর্যাপ্ত যোগানের জন্য তা ব্যাহত হয়।[32] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বন ও বন্য সম্পদের ব্যবহার ও শোষনের যে প্রবাহমান ধারা চলছিল তার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ১৮৯০ সালে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যত রাজস্ব আদায় করত ১৯২০ সালে এই রাজস্ব আদায় পরিমাণ তিন গুণ বেড়েছিল। এই রাজস্ব এসেছিল প্রধানত কাঠ বিক্রি থেকে। ১৮৯০ সালে যেখানে ৬০০০০০ কিউবিক ফুট কাঠ বিক্রি করেছিল সেখানে ১৯১৫-১৬ সালে বেড়ে হয়েছিল ৮.৩ মিলিয়ন কিউবিক ফুট।[33] রেল শ্লিপারের জোগান অব্যাহত রাখা এবং আরো বেশি করে রাজস্বের জন্য সরকার ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট শুরু করে। শুরু হয় নতুন করে শাল ও সেগুন গাছের রোপন। দেশীয় জঙ্গলের পরিবর্তে জায়গা নেয় অর্থকারী বনজ সম্পদ। ফলে বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকেও এক বিরাট পরিবর্তন আসে। বনে বসবাসরত জন্তু জানোয়ারদের স্বভাব চরিত্রে পরিবর্তন আসে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই 'সাধারণ বাঘ হয়ে ওঠে মানুষ খেকো বাঘ'। মানুষ ও বন্য প্রানীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

সাল	বাঘ হত্যার সংখ্যা	বাঘের দ্বারা মানুষ হত্যার সংখ্যা
১৯০০-০১	৩	২৫
১৯০১-০২	৩ + ১ শিশু	৮৬
১৯০২-০৩	৮	৪৮
১৯০৩-০৪	৯	৬৬
১৯০৪-০৫	১১	৯৯
১৯০৫-০৬	২৩	১০১
১৯০৬-০৭	১১	৮৩
১৯০৭-০৮	১১ + ২ শিশু	১২০
১৯০৮-০৯	২৩ + ৬ শিশু	১০৩
১৯০৯-১০	তথ্য নেই	১০৬
১৯১০-১১	৩০	১৩৮
১৯১১-১২	৬১	১৪২
১৯১২-১৩	৩৭	৭০
১৯১৩-১৪	৩১	৮১
১৯১৪-১৫	৩৬ + ৩ শিশু	৭৯
১৫ বছর	৩০৯ টি	১৩৪৭ জন

Source: several PRAF 1900-01 to 1914-15

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বাঘের আক্রমনে মানুষের মৃত্যু প্রায় চার গুণ বেশি। এই সংঘর্ষ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং ব্রিটিশ অর্থনীতি সচল রাখার কারনে Reward Hunting শুরু হয়। এছাড়াও ব্রিটিশ অফিসার এবং ভারতীয় রাজা বা জমিদারদের রাজকীয় শিকারের ছাড়পত্র প্রদান করা হত। বন আইন অনুসারে সাধারণ মানুষদের বন থেকে সমস্ত অধিকার কেড়ে নিলেও রাজা, জমিদার বা সরকারি ব্রিটিশ আধিকারিকদের জন্য শিকারের ছাড়পত্র দেওয়া হত। খুবই অল্পদিনের মধ্যে এতো বেশি শিকার করা হয়েছিল যে সমগ্র দেশ জুড়ে বন্য প্রানীদের সংখ্যা খুবই হ্রাস পেয়েছিল। একজন দেশীয় শিকারী আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন, বর্তমানে দেশে বন্য প্রানীর সংখ্যা নানা কারনে হ্রাস পেয়েছে, এমনকি কোন কোন প্রানী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে আজ সর্বত্র শিকার করা আইন সিদ্ধ নয়।[34] এই পরিসংখ্যানটি দেওয়া হয়েছে বিংশ শতকের প্রথম পনেরো বছরের। রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতি বছর বাঘের হাতে প্রায় ১৬০০ জন করে নিহত হতেন।[35] পরে ১৫ বছরে বাঘ মারার সংখ্যা হয়ে পরে প্রায় তিন গুণ। ১৯১৬-১৯৩০ সালের মধ্যে মোট ৮৩৯ ট বাঘ মারা হয়েছিল।[36] তবে পরাধীন ভারতের শেষ কয়েক বছর আগের তুলনায় বাঘ হত্যা করার প্রবণতা আগের থেকে কমতে থাকে। তবে বেঙ্গল ফরেস্ট রিপোর্ট গুলো ঠিক করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, বাঘ নিধন প্রথম পর্বে সুন্দরবনে বেশি হয়েও ১৯৩০ এর দশকের পর থেকে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এ বেশি বাঘ নিধন শুরু হয়।[37] শুধুমাত্র বক্সা ডিভিশনে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ১৫০ টি বাঘ মারা হয়েছিল।[38]

বন আইন গুলিতে সেই ভাবে বন্য প্রানীদের সংরক্ষণের কথা উল্লেখ না থাকলেও বন বিভাগ বন্য পশুদের গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিল। বনে শিকার করার জন্য ছাড়পত্র নিতে হত বন বিভাগ থেকে। সময়ের

সাথে সাথে শিকার করার জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৭-২৮ সালের বন বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে, তুলনা মূলক ভাবে ঐ বিভাগে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলস্বরূপ হরিণ শিকার করার ছাড়পত্র দেওয়ার পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে, ঐ বছর হরিণ শিকারের জন্য ৯৭ টি ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, আগের বছর ৭৪ টি ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল।[39] ১৯২০ দশকে শ্যুটিং ক্লাবগুলি গড়ে উঠতে থাকে। যেমন ১৯২৩-২৪ সালে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে দুটি শ্যুটিং ক্লাব গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান গুলির সদস্যরা বন্য প্রানী সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। চোরা শিকারের হাত থেকে বন্য পশুদের রক্ষা করার জন্য আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন।[40] দুই বছর পর বক্সাতে অনুরূপ একটি শ্যুটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।[41] ১৯৩০ এর দশক থেকে বাঘ মারার সংখ্যা আগের পনেরো বছরের থেকে তুলনা মূলক ভাবে কমতে থাকে।

বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় প্রতিটি প্রানীর নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা প্রাচীন ভারতের নানান সাহিত্যে ও রীতিনীতিতে উঠে এসেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের ফলে সেই পরম্পরা বিনষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় রীতিনীতিকে গুরুত্ব দেওয়ার থেকে তারা তাদের নিজেদের জাতি সত্ত্বাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল এবং বন্য প্রানী শিকারে মত্ত হয়ে উঠেছিল। কিছু কালের মধ্যেই বন্য প্রানীর সংকট দেখা দিলে তা ব্রিটিশ প্রশাসকদের ভাবিয়ে তোলে। তবে তখন তারা বন্যপশুদের গুরুত্ব অনুভব করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। যেমন, হাতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৭৯ সালে Elephant Preservation Act 1879 চালু করেন। এছাড়াও অন্যান্য বন্যপ্রানী সংরক্ষণ আইন গুলি হল The wild Birds and Animal Protection Act 1912, Bengal Rhinoceros Preservation Act 1932, ইত্যাদি। তবুও সরকারের প্রয়োজনে বা উচ্চ আধিকারিকদের আনন্দ প্রদানের জন্য সমানে শিকার চলতে থাকে।

তথ্যসূত্র

[1] Hussain, Shafaq, Sports-hunting, Fairness and Colonial Identity: Collaboration and Subversion in the North-western Frontier Region of the British Indian Empire, Conservation and Society, 8(2), 2010, p. 112-126

[2] Choudhary, Dr. Manisha; Setting the Game of Ferocity and Innocence: Hunts of Jahangir, American Research Journal of History and Culture, 4(1), 2018, p. 1-18; Kabir, Ashraful; Mughal painting of hunt with their aristocracy, Arts and Humanities Open Access Journal 3(1), 2019, p. 65-67

[3] Simson F. B; Letters on Sport in Eastern Bengal; R. H. Porter, London, 1886, p. 2

[4] পন্নী, মোহম্মদ বায়াজীদ খান; বাঘ-বন-বন্দুক, (শিকার জীবনে সত্য ঘটনা নিয়ে), তওহীদ প্রকাশক, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ১২

[5] দেবশর্ম্মা, শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী; ঝিলে জঙ্গলে শিকার, হিতোবাদী প্রেস, ক্যালকাটা, পৃঃ ৪

[6] Shakepear, Henry; The Wild Sports of India: with detailed instruction for the sportsman; to which are added remarks on the breeding and rearing of horses, and the formation of light irregular cavalry, Smith, Elder and Co., London, 1862

[7] দেবশর্ম্মা, শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪

[8] দেবশর্ম্মা, শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী; পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৮

[9] Shakepear, Henry, op.sit., p. 1

[10] চৌধুরী, শ্রীবজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য, শিকার ও শিকারী, (শিকার কাহিনী), শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৮-২৯

[11] চৌধুরী, শ্রীবজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৪

[12] সুশীল কুমার ঘোষ, (সম্পাঃ) শিকার, প্রাক্ কথন-২, নবপত্র প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ ৫-৬

[13] Sen, Amrita; Human-Wildlife Conflicts in the Sundarbans Biosphere Reserve and the Politics of Forest Conservation, Decision, 46(4), 2019, pp. 321-333

[14] চৌধুরী, শ্রীবজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৪

[15] Chakrabarti, Ranjan; Situating Environmental History, Manohar, New Delhi, 2007, p. 28
[16] 100 years of Indian Forestry, 1861, p. 103; See for details; Thirty-Seven Years of Big Game Shooting in Cooch Behar, Duars and Assam, A Rough Diary, The Maharaja of Cooch Behar; Printed at the Time Press Bombay, 1908
[17] Guha, Ramchandra; The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya, OPU, New Delhi; Gadgil and Guha, This Fissure Land: An Ecological History of India. OPU, New Delhi, 1992
[18] Kumar, V. M. Ravi; Colonialism and Green Science: History of Colonial Scientific Forestry in South India; 1820-1920; Indian Journal of History of Science, 42(2), 2012, pp. 241-259
[19] Baden-Powell B. H., Land System of British India, 1892
[20] Rajan Ravi, Modernizing Nature: Forestry and Imperial Eco-Development 1800-1950, OPU, 2006, p. 64
[21] Sivaramkrishnan, K., Modern Forests: State making and Environmental Change in Colonial Eastern India, OUP, 1999, Skaria, Ajay; Hybrid Histories: Forests, Frontiers and Wilderness in Western India; Oxford University Press, Delhi, 1998, Dangwal D. D.; 'Scientific Forestry and Forest Management in Colonial and Postcolonial India', Contemporary India, Vol-I, 2001
[22] Final Report on the Survey and Settlement of the Western Duars in the District of Jalpaiguri, 1889-1894, by D H E Sunder, The Bengal Secretariat Press, 1895, Edited by D. C. Roy, N L Publishers, Siliguri, 2013, p. 234
[23] Administration Report of Bengal, 1875-76, p. 27
[24] Ahamed, Sahara; Scientific Forestry and Popular Proclivities: Jalpaiguri, 1870s-1950s; in People at large Popular Culture in Modern Bengal, Amitav Chatterjee (ed.) Setu, Kolkata, 2012, p. 71
[25] WBSA, Progress Report of Forest Administration in the Lower Province of Bengal (next PRAF) 1900-1901, para 2, p. 1
[26] PRAF, 1901-02, para 1, p. 1
[27] PRAF 1902-03, para 2, p.1
[28] PRFA, 1903-04, para 1 and PRFA1909-10, para 1
[29] Waddell, L A; Among the Himalayas; Cosimo Inc. in cited O'malley. Bengal District Gazetteer Darjeeling, p. 98
[30] Fisher, W. R.; Schlich's Manual Forestry, vol-V, Bradbury, London, 1896, pp. 118-120
[31] PRFA 1900-1901, para 54, p. 17
[32] PRFA 1904-05, para 74, p. 19
[33] Sivaramkrishnan, Science, Environment and Empire History: Comparative Perspectives from Forests in Colonial India, Environment and History, 14 (1), 2008, p. 52
[34] সুশীল কুমার ঘোষ, (সম্পাঃ) শিকার, প্রাক্ কথন-২, নবপত্র প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ XI
[35] Chakrabarti, Ranjan; Local people and the Global Tiger: an environmental history of the Sundarbans, Global Environment: A journal of Transdisciplinary History 2(3), 2009, pp. 72-95
[36] PRAF 1915-16 to 1929-30
[37] PRAF 1930-31 to PRAF 1947-48
[38] Tiger Conservation Plan 2016-17 to 2026-27, Prepared by Bhaskar J. V. and Assisted by Kalyan Rai, Under Guidance and supervision of Dr. R, P, Saini, Sri S. Sundriyal, Sri U. Ghosh, Field Director, Buxa Tiger Reserve, pp. 65-66
[39] PRAF 1927-28, p. 24
[40] PRAF 1923-24, p. 13
[41] PRAF 1925-26, p. 16